| | | | |
|---|---|---|---|
| <?xml version="1.0" ?> | | | |
| <?xml-stylesheet type="text/css" href="home.css"?> | | | |
| <Doc id="BN-w-media- | | " | lang="Bengali"> |
| <Header type="text"> | | | |
| <encodingDesc> | | | |
| <projectDesc> | CIIL-Multilingual parallel text corpora | | </projectDesc> |
| <samplingDesc> | Simple written text only has been transcribed. Diagrams, pictures and tables have been omitted. Samples taken from page 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | | </samplingDesc> |
| </encodingDesc> | | | |
| <sourceDesc><br><biblStruct><br><source> | | | |
| | <category> | Aesthetics | </category> |
| | <subcategory> | Literature-Translation | </subcategory> |
| | <text> | Book | </text> |
| | <title> | Keshavsut | </title> |
| | <author> | Prabhakar Machwe | </author> |
| | <language> | Bengali | </language> |
| | <translator> | Kashitis Roy | </translator> |
| | <vol> | | </vol> |
| | <issue> | | </issue> |
| </source> | | | |
| <textDes> | | | |
| | <type> | | </type> |
| | <headline> | Jeevani | </headline> |
| | <words> | 3505 | </words> |
| </textDes> | | | |
| <imprint> | | | |
| | <pubPlace> | India-New Delhi | </pubPlace> |
| | <publisher> | Sahitya Akademi | </publisher> |
| | <pubDate> | 1969 | </pubDate> |
| </imprint> | | | |
| <index> | | | </index> |
| </biblStruct><br></sourceDesc> | | | |
| <profileDesc><br><creation> | | | |
| | <date> | 24-Jul-2006 | </date> |
| | <inputter> | Urmila | </inputter> |
| | <proof> | | </proof> |
| </creation> | | | |
| <langUsage> | | | </langUsage> |
| <wsdUsage> | | | |
| <writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS).<br></writingSystem> | | | |
| </wsdUsage> | | | |
| <textClass> | | | |
| <channel mode="w"> | | print | </channel> |
| <domain type="public"> | | | </domain> |
| </textClass><br></profileDesc><br></Header> | | | |

<text><body>

 জীবনী 

 কেশবসূতের জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কবির প্রথম জীবনচরিত লিখেছেন তাঁর ছোট ভাই সীতারাম কেশব দামলে। তাঁর কাছে কেশবসূতের যে জন্মপত্রিকা ছিল তার উপর নির্ভর করে তিনি জন্মকাল লিখেছিলেন ১৪ ফাল্গুন ১৭৮৭ শকাব্দ, অর্থাত খৃষ্টীয় ১৮৬৬ অব্দের ১৫ মার্চ। এই তারিখ নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন কোষ্ঠীতেই কিছূ ভুল থেকে থাকবে। কেউ কেউ ভারতীয় তিথি গণনা-অনুসারে মলমাস যোগ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ভারতীয় ও ইংরেজি তারিখের মধ্যে মিল নেই। কারও কারও মতে কেশবসূত জন্মেছিলেন ৭ অক্টোবর ১৮৬৬ অব্দে। যে 'কাব্যরত্নাবলী' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত, তাঁদের ১১০৫ অব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় কেশবসুতের মৃত্যুর কাল বলতে গিয়ে তাঁরা লিখেছিলেন যে ১৮৬৬ অব্দের মার্চ মাসে তাঁর জন্ম। ১৯০৬ অব্দের 'মনোরঞ্জন' পত্রিকায় কেশবসূতের পরলোকগমন প্রসঙ্গে তাঁরাও এই মার্চ মাসের উল্লেখ করেন। এই সব নানাবিধ প্রমাণ থেকে এইটুকুই নিশ্চিত বলা যায় যে কেশবসূতের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৬ অব্দে-যদিচ জন্মতারিখ নিয়ে মতের মিল দেখা যায় না। মার্চ ১৯৬৬ সংখ্যা 'সত্যকথা' পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখতে গিয়ে শ্রীমতী বিজয়া রাজাধ্যক্ষ ৭ অক্টোবর ১৮৬৬ তারিখটাই কবির জন্মতারিখ বলে চিহ্নিত করেছেন। 

 তাঁর জন্মস্থান এমন কি মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। যদিচ তাঁর জীবনীকারদের কেউ কেউ মনে করেন যে মহারাষ্ট্রের কোংকণ অঞ্চলে রত্নাগিরির নিকটবর্তী মালগূন্ড গ্রামে তাঁর জন্ম, কবির নিজের লেখা স্কুল রেকর্ড-অনূসারে দেখা যায় তিনি জন্মেছিলেন দাপোলী জেলার কলণেও নামকে গ্রামে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের রাজ্য-সরকার কবির জন্মস্থানে স্মারক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এক সভা ডাকেন। সেই সভাতেও কোন বাড়িতে তিনি যে জন্মেছিলেন-এই প্রশ্ন নিয়ে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিলে। 

 কবির মৃত্যু তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। তিনি যে ৩৯ বছর বয়সে অকালে প্লেগ রোগ কিংবা কলেরায় হুবলি শহরে মারা যান, সে কথা নিশ্চিত। বলা হয় ১৯০৫ অব্দে নভেম্বর মাসের কোনো এক দিন দূপূরবেলা তাঁর প্রাণবিয়োগ হয় এবং তাঁর মৃত্যুর আট দিন পরে ১৯০৫ অব্দের ১০ নভেম্বর তাঁর স্ত্রীও মারা যান। এতৎসত্ত্বেও শ্রী ন. শং. রহালকার ও কেশবসূতের জীবনীকার সেই ছোট ভাই কবির মৃত্যুতারিখ ২ নভেম্বর বলে স্থির করেছেন। এই ভাই ছিলেন কবির চেয়ে বারো বছরের ছোট। 'কেশবসূতাঞ্চি কবিতা' নামে কাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাস্বরূপ তিনি এই জীবনকথা রচনা করেছিলেন। এটিই কবির প্রথম জীবনচরিত। এই তারিখের ভুল পরে কেশবসূতের জনৈক ভ্রাতুষ্পূত্র শ্রীপরশরাম চিন্তামণ দামলে উক্ত কাব্যসংগ্রহের চতুর্থ সংসকরণে সংশোধন করে দেন। সূতরাং ১৯০৫ অব্দের ৭ নভেম্বর কেশবসূতের মৃত্যুর তারিখ বলে নিশ্চিত মেনে নেওয়া যায়। 

 তাঁর রচিত কবিতার দূ জায়গায় কবির জন্মস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। 'নৈঋত্যেকভীল বারা' (নৈঋতকোণের বাতাস)স কবিতায় তিনি মালগূন্ড গ্রমের সংস্কৃত রূপান্তর দিতে গিয়ে বলেছেন মাল্যকূট। কোনো কোনো সমালোচকের মতে 'এক খেড়ে' (এক গ্রাম) নামক বাল্যস্মৃতিবিজড়িত একটি গ্রামের বর্ণনায় তিনি যা 

| | | |
|---|---|---|
| | লিখেছেন, তার ফুল ফল, গাছপালা, পশুপাখি এবং ‘কত যে তরী জাহাজ ভেসে যায়, সুনীল দরিয়ায়-...’ এই সব উল্লেখ থেকে যে জায়গার কথা স্বতঃই মনে পড়ে, সে হল বলণেঁ। দামলেরা ছিলেন চিৎপাবন কোকণস্থ ব্রাহ্মণ। এঁদের আদিনিবাস ছিল রত্নাগিরির কাছাকাছি কোলং গ্রামে। কেশবসুতের বাবা কেশবসুত বিটঠল ওরফে কেসোপন্ত দামলে মারাঠী স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে, পৈতৃক পেশা চাষবাস ছেড়ে স্কুল মাস্টারের কাজ নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছর। সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরি করতে করতে তাঁর মাসিক বেতন তিন টাকা থেকে শুরু করে বাড়তে বাড়তে ত্রিশ টাকা অবধি পৌঁছায়। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি দশ-এগারো টাকার পেনসন নিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেন। অতঃপর তিনি বিশ্বনাথ নারায়ণ মন্ডলীক নামধেয় একজন প্রসিদ্ধ গ্রামনেতা ও দামলে পরিবারের হিতৈষী জমিদারের বলণেঁ গ্রামে অবস্থিত জমিজমার তদারকি কাজে নিযুক্ত হন। ‘সিংহাব-লোকন’ নামে একটি কবিতায় কেশবসুত এই গ্রামের কথা লিখেছেন। কবিতাটি ওয়র্ডস্বার্থ-এর ‘দি প্রিলিউড’কবিতার ঢঙে লেখা। যদিও কেসোপন্তের আয় ছিল সামান্য, তিনি ধারকর্জ না করে এক প্রকার মনের সুখেই সংসারনির্বাহ করতেন। নিয়মনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা ও দৃঢ়সংকলেপর জন্য তাঁর বেশ সুনাম ছিল। কেশবসুত কবিতায় তাঁর পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। ১৮৯৩ অব্দে কেসোপন্তের মৃত্যু হয়। | |
|  | কেশবসুতের মা ছিলেন মালদৌলীর জমীদার করন্দীকর পরিবারের কন্যা। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। ১৯০২ অব্দে উঙজয়িনীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের কাছ থেকে কেশবসুত পেয়েছিলেন তাঁর ভাবুক স্বভাব, ভগবদভক্তি, চিত্তের প্রসার ও উদার মানবিকতা। মায়ের মৃত্যুর পর কেশবসুত একটি শোকগাথা রচনা করেছিলেন। |  |
|  | কেশবসুত ছিলেন তাঁর মা-বাবার চতুর্থ সন্তান। ওঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও ছ বোন। বড় ভাই এগারো বছর বয়সে জলে ডুবে মারা যান। মেজো ভাই ছিলেন শ্রীধর। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। রত্নাগিরি কেন্দ্র থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য তিনি জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮২ অব্দে এলফিনস্টোন কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন ও বড়োদার নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজ সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু কাজে যোগ দেবার এক বছর পরেই ১৮৮৩ জানুয়ারিতে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। |  |
|  | শুরুতে কেশবসুতের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যথোচিত নজর দেওয়া হয় নি। রত্নাগিরি জেলার খন্ড নামক গ্রামে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি আর তাঁর ছোট ভাই একই সঙ্গে পড়তেন। পরে ইংরেজি শেখার জন্য দুই ভাইকেই বড়োদা পাঠানো হয়। তখনকার কালের প্রথা অনুসারে বাল্য বয়সেই দুই ভায়ের বিয়ে দেওয়া হয়। তখন কেশবসুতের বয়স ১৫ ও তাঁর ছোট ভাইয়ের ১৩। কেশবসুতের স্ত্রী রুক্মিণীবাই ছিলেন চিতলে পরিবারের মেয়ে। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল আট বছর। রুক্মিণীবাই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায় তাঁর খুব দয়ামায়া ছিল, কায়িক পরিশ্রমে তিনি খুব পটু ছিলেন, কিন্তু তিনি সুন্দরী ছিলেন না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন লাজুক প্রকৃতির ও অ-সামাজিক। কেশবসুতের তিন মেয়ের নাম ছিল মনোরমা, বৎসলা ও সুমতী। ‘স্নাতারী’ কবিতায় কেশবসুত তাঁর মেজো মেয়ের কথা লিখে গেছেন। কেশবসুতের শ্বশুর কেশব গঙ্গাধর চিতলে ছিলেন খান্দেশ জেলার চালিশগাঁও গ্রামের একটি মারাঠী স্কুলের হেডমাস্টার। |  |

| | | |
|---|---|---|
|  | কেশবসূতের ছেলেবেলা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা থেকে মনে হয় তিনি দূর্বল ছিলেন ও তাঁর স্বভাব ছিল বেশ খিটখিটে। দূর্বল শরীরের জন্য তিনি খুব বেশি দৌড়ঝাঁপ বা পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলা করতে পারতেন না। একা একা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে বেড়াতেন ও কথা বলতেন খুবই কম। তাঁর মা বলতেন যে ছেলেটা কেমন যেন খেয়ালী মতন। যদিচ তাঁর চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু কিছু বলেছেন। 'তিনি ছিলেন বেশ ভাবুক ও গম্ভীর প্রকৃতির' (কিরাত)। 'সচরাচর মূখ নিচূ করে কথা বলতেন, কিন্তু চোখ তুলে চাইলে মনে হত তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী' (বিনায়ক করন্দীকর)। 'তিনি মাথায় ছিলেন পাঁচ ফূটের সামান্য বেশি' (গদ্রে)। তাঁর গায়ের রঙ ছিল গৌর, মূখের ডোল ছিল গোল, কপাল সারাক্ষণ কুঁচকে থাকত। একবার তাঁর বিষন্ন মূখ দেখে একজন মাস্টারমশায় কবিকে তিরস্কার করেছিলেন। কেশবসূত তাঁর 'দূর্মূখলেলা' কবিতায় লিখেছেন: |  |
|  | কুরূপ কবি বিধির বরে |  |
|  | করবে নূতন রচনা, |  |
|  | পড়বে দেখো জগত জনে |  |
|  | হরষ ভরে কত না। |  |
|  | এমূখ থেকেই ঝরবে জেনো |  |
|  | অমৃতেরি নির্ঝরণ, |  |
|  | পান করে সে মধূর সূধা |  |
|  | তৃপ্ত হবে বিশ্বজন। |  |
|  | কুরূপ দেখে বিরূপ তুমি, |  |
|  | দেখবে তোমার বংশধর |  |
|  | কবির কেমন আনন ছিল |  |
|  | কইবে নাকো অতঃপর। |  |
|  | (১৮৮৬) |  |
|  | এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো-নিজের ফোটো তোলায় কবির অসাধারণ বিরাগ ছিল। যদিচ তাঁর ভাইদের ফোটো পাওয়া যায়, তাঁর জীবিত-কালে কেশবসূতের ফোটো নেওয়াও হয়নি, ছবি আঁকাও হয়নি। উজ্জয়িনীতে তাঁর দাদা দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে একবার দামলে পরিবারের সকলে একত্রিত হয়েছিলেন। প্রস্তাব হয় সমস্ত পরিবারের একটি ফোটো তোলা হোক-কেশবসূত সে প্রস্তাবে রাজি হন নি। |  |
|  | বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর একটি কবিতায় দেখা যায় তখানকার দিনে মাস্টারমশায়রা ছেলেদের বেদম প্রহার করতেন ও নানারকম সাজা দিতেন। এতে তিনি গভীর আঘাত পেয়েছিলেন এবং তাঁর মন থেকে এই দাগটুকু কখনো মূছে যায় নি। |  |
|  | ১৮৮২ অব্দে কেশবসূত বড়েদায় তাঁর দাদা শ্রীধর কেশবের কাছে যান। তিনি তখন বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে বি. এ. পাশ করে সংস্কৃত ও গণিতের অধ্যাপকরূপে সেখানে কাজ করছেন। দূঃখের বিষয় দাদার ওখানে কেশবসূত আট মাসের বিশি থাকতে পারেন নি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীধর অকালে প্রাণত্যাগ করেন- বি. এ. পাশ করার ঠিক এক বছর বাদে। সমস্ত দামলে পরিবার এই শোকের আঘাতে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। পড়াশূনো চালিয়ে যাবার জন্য কেশবসূতকে তখন চলে যেতে হয় তাঁর মামা রামচন্দ্র গণেশ করন্দীকরের আশ্রয়ে। ইনি ওয়ার্ধায় ওকালতি করতেন। তখনকার দিনে ওয়ার্ধায় ইংরেজি শেখার সূব্যবস্থা ছিল না। |  |

| | | |
|---|---|---|
| | এইজন্য ‘কৃষ্ণাজী’ ও তাঁর ছোট ভাই মোরোপন্তকে নাগপুরে পাঠানো হয়। কিন্তু নাগপুরে ছেলেদের শিক্ষার ব্যয় চালাবার মতো অবস্থা কেশবসুতের বাবার ছিল না, তাছাড়া নাগপুরের প্রচন্ড গরম কেশবসুতের দূর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে অসহ্য মনে হয়েছিল। নাগপুরে তিনি যে সাত মাসকাল ছিলেন, সে সময় প্রসিদ্ধ মারাঠী কবি রেভারেন্ড নারায়ণ বামন টিলক এবং অধ্যাপক পটবর্ধনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শেষোক্তের উপরে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি কবিতাও লিখেছিলেন। | |
|  | রেভারেন্ড নারায়ণ বামন টিলকের সংস্পর্শে এসে কেশবসুত কবিতা রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে টিলক লিখেছেন: “কেশবসুতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ আমি সূচনা থেকে অনুধাবন করেছিলাম। ১৮৮৩ অব্দে আমরা নাগপুরে দু-তিন মাসের জন্য বেশ কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। পরে তাঁর সঙ্গে ১৮৮৮-৮৯ অব্দে পুণায়, এবং ১৮৯৫-৯৬ অব্দে বোম্বাই শহরে আবার দেখা-সাক্ষাত হয়।” পুণায় যখন দেখা হয় তখন কেশবসুত নিউ ইংলিশ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বোম্বাইয়ে দেখা হবার সময় কেশবসুত খ্রীষ্টীয় মাসিক ‘জ্ঞানোদয়’ পত্রিকার কার্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। টিলক পূর্ব থেকেই ‘জ্ঞানোদয়’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৯৫ অব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান হন। টিলক ও ‘জ্ঞানোদয়’ পত্রিকার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক থাকার দরুন কেশবসুতের আত্মীয়বর্গের আশঙ্কা হয়েছিল তিনিও না খ্রীষ্টান হয়ে যান। কেশবসুত বাইবেল পড়তে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি তাঁর ছোট ভাই সীতারামকে বলেও ছিলেন যে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করায় ইচ্ছুক (দ্রঃ বি. স. করন্দীকর, ‘রত্নাকর’, ফেব্রুয়ারি-১৯২৬)। টিলকের সঙ্গে বন্ধুতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দুজনের কবিতার মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর। কেশবসুতের কবিতায় ওজস্বিতা ও প্রতিভার একটা অপ্রত্যাশিত চমক ছিল। টিলকের কাব্য ছিল শান্ত ভাবের, উদ্দীপনার ওঠাপড়া তাঁর মধ্যে তেমন ছিল না। টিলক কেশবসুতের এমনই গুণগ্রাহী ছিলেন যে তাঁর জীবিতকালেই তিনি কেশবসুতের উপর একটি কবিতা রচনা করেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি দুটি শোকের কবিতা লিখেছিলেন, একটি জানুয়ারি ১৯০৬ সংখ্যা ‘কাব্যরত্নাবলী’ ও অন্যটি ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ সংখ্যা ‘মনোরঞ্জন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। |  |
|  | নাগপুরে তিনি যে অলপকালের জন্য ছিলেন, সে সময় কেশবসুতের সঙ্গে সমাজ সংস্কারক বাসুদেব বলবন্ত পটবর্ধনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ১৮৮৮ অব্দে পটবর্ধনের প্রশস্তিতে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। অনুমান হয় কাব্যের আদর্শ বিষয়ে পটরর্ধনের মতবাদ কবির উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রগতিবাদী, দুজনেই নির্জনতা ভালোবাসতেন ও লোকজনের ভিড় পছন্দ করতেন না। পরে পটবর্ধন ডেকান এডুকেশন সোসাইটির আজীবন সদস্যশ্রেণীভূক্ত হন এবং আগরকরের পরে ‘সুধাকর’ অর্থাত ‘সংস্কারক’ পত্রিকার সম্পাদক হন। পটবর্ধনের উপর কেশবসুত যে-কবিতা লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন: |  |
|  | আত্মার আলো হয়ে জ্বলে আকাশে |  |
|  | সে আলো স্বচ্ছ |  |
|  | কবির মুগ্ধ চোখে। |  |
|  | জমাট দুখের অন্তর হেরে কবি |  |
|  | অনড় অটল |  |
|  | প্রস্তর দেখে লোকে। |  |

| | | |
|---|---|---|
|  | কোনো কোনো সমালোচক এই কয় ছত্রে এমার্সন-এর প্রভাব দেখতে পান। আসলে এমার্সন প্রভাবিত হয়েছিলেন বেদান্তর দ্বারা। কেশবসূত নিজের অজ্ঞাতে অপ্রত্যক্ষভাবে এখানে সর্বভূতাত্মার উল্লেখ করেছেন। |  |
|  | ১৮৮৩ অব্দে কেশবসূত নাগপূর ছেড়ে, কোংকণস্থ নিজ গ্রাম খেড়-এ ফিরে যান এবং সেখানে এক বছর বসবাস করেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পূণায় যান। নিউ ইংলিশ স্কুলের কাগজপত্রে দেখা যায় ১৮৮৪ অব্দের ১১ জূন কেশবসূত এই স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ১৮৮৯ অব্দ অবধি পূণায় বসবাস করেন, এবং চব্বিশ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরকম পরিণত বয়সে তাঁর ম্যাট্রিক পাশ করার অন্যতম কারণ-তিনি দু-দুই বার ইংরেজিতে যথেষ্ট নম্বর না পাওয়ার দরূন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ফেল হবার আর একটি কারণ এই যে তিনি খুব ধীরে ধীরে লিখতেন। একবার তো কাব্যর্চ্চায় এমন মশগূল হয়েছিলেন যে যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে পারেন নি। |  |
|  | নিউ ইংলিশ স্কুলে থাকা-কালে তাঁর সঙ্গে হরিনায়ণ আপটের সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি মরাঠী ভাষায় সূপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার। ইনিই কেশবসূতের মৃত্যুর পর তাঁর লেখা একমাত্র কবিতাসংগ্রহের সম্পাদনা ও প্রকাশনার ভার নেন। আপটে কেবল যে কেশবসূতের সহপাঠী ছিলেন এমন নয়-তিনি কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন। পূণাতে থাকতেই গোবিন্দ বাসূদেব কানিকটকরের সঙ্গে কেশবসূতের সাক্ষাত হয়। কানিটকর ছিলেন একাধারে কবি ও অনূবাদক। ইংরেজি সাহিত্যে এঁর গভীর অনূরাগ ছিল এবং স্ত্রী-শিক্ষার ইনি একজন বড় সমর্থক ছিলেন। কানিটকরের পত্নীও একজন বিদূষী মহীলা ছিলেন। জাস্টিস মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে কানিটকরের আখ্যনমূলক দীর্ঘ কবিতার প্রশংসা করে গেছেন। ওয়াল্টার স্কটের অনূসরণে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কানিটকর কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আকবর' ও 'কৃষ্ণকুমারী'। কানিটকর মিসেস হাইমেন্স, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ ও তরূ দত্তের কবিতার ভক্ত ছিলেন। টমাস মূর, টমাস হুড, বাইরণ, কীটস প্রভৃতি কবির কবিতা তিনি মারাঠীতে অনূবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জন স্টূয়ার্ট মিল-এর 'সাবজেকশন অব উইমেন' অর্থাত নারীর দাসত্ব। কানিটকর দমপতি, আপটে ও কেশবসূত নিয়মিত লেখা পাঠাতেন 'মনোরঞ্জন আনি নিবন্ধচন্দ্রিকা' নামক মাসিকপত্রে। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ অব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকায় কেশবসূতের তেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়। |  |
|  | বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে নিয়মিত ইংরেজি কাব্যপাঠের দ্বারা কেশবসূতের কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলেন ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সীমিত ছিল পলগ্রেভ-এর 'গোল্ডেন ট্রেজারী' ও ম্যাকে-এর 'এ থাওজেন্ড এন্ড ওয়ান জেমস অব ইংলিশ পোয়েট্রি' দ্বারা। কিন্তু তিনি যে আরও অনেক কিছু পড়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বহু চিঠিতে এমার্সন-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেখে। তিনি যে তরূদত্তের 'এ শীফ ব্লিনড় ইনি ফ্রেঞ্চ ফিল্ডস্' পড়েছিলেন, তারও প্রমাণ দেখা যায়। তিনি ড্রামন্ড, গ্যেটে, পো, লংফেলো এবং সেক্সপীয়র-এর কিছু কিছু সনেট অনূবাদ করেছিলেন। ইংরেজিতে কবিতা রচনাতেও তিনি হাত লাগিয়ে ছিলেন। অধ্যাপক মং. বি. রাজধ্যক্ষ তাঁর 'পাঁচ মারাঠী কবি' গ্রন্থে লিখেছেন যে কেশবসূত সংস্কৃত কাব্যও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক সে কথা মেনে নেন নি কারণ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কেশবসূত সংস্কৃতে ভালো নম্বর পান নি বলে দেখা যায়। |  |

| | | |
|---|---|---|
|  | যদিচ নিউ ইংলিশ স্কুলে আগরকর ও লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো প্রখ্যাত অধ্যাপকেরা ছিলেন, দেখা যায় তাঁরা যেসব বিষয় পড়াতেন তাতে কেশবসূতের তেমন রুচি বা আগ্রহ ছিল না। বরঞ্চ তাঁর উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমাজসংসকারক আগরকর। কেশবসূত ক্লাসে বসে কাগজের উপর হিজিবিজি কাটতেন, লোকমান্য প্রভৃতি অধ্যাপকদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। কিন্তু সমসাময়িক কালের নামজাদা বাগ্মীদের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পূণার আকাশে তখন আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ১৮৮০ অব্দ থেকে চিপলূণকর তাঁর 'নিবন্ধমালা' পত্রিকায় বলতে লেগেছেন যে ইংরেজি শিক্ষা হল 'বাঘের দূধ' খাওয়ার নামান্তর। তিলক 'কেশরী' পত্রিকার স্তম্ভে তখন সিংহনাদ করছেন। আগরকর তাঁর 'সূধাকর' পত্রিকায় সমাজসংস্কারের নতুন যুগকে আবাহন করছেন। কির্লোস্কর ও ভাবে-এর হাতে মরাঠী রঙ্গমঞ্চ তখন নূতনভাবে নির্মিত হচ্ছে। হরিনারায়ণ আপটে মারাঠী কথাসাহিত্যিকে নূতন রূপ দান করেছেন। কিন্তু কেশবসূত মানূষটা ছিলেন লাজূক প্রকৃতির। রাষ্ট্রিক বা সামাজিক আন্দোলনের রথ যে-সব পথ প্রকম্পিত করে চলে, সেই সব পথে তাঁর আনাগোনা ছিল না বললেই চলে। কাব্যরচনার অভ্যস্ত পথে চলতে গিয়ে তিনি হয়তো শেলীর মতো ভেবেছিলেন: |  |
|  | নব জীবনের আবাহন উৎসবে |  |
|  | ছড়াব দূহাতে মরণের ঝরাপাতা.....(ওড টু দি ওয়েস্ট উইনড) |  |
|  | এখানে কবির উপর তাঁর দূই ভাইয়ের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিষয়ে দূচার কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর ছোট ভাই মোরো কেশব দামলে (১৮৬৮-১৯১৩) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও ইতিহাসে বি. এ. পাশ করেন। উজ্জয়িনীর মাধব কলেজে ১৮৯৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৮ অব্দে উজ্জয়িনীর কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি নাগপূর সিটি স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। ১৯১৩ অব্দে পূণায় এক শোচনীয় রেল দূর্ঘটনার ফলে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯১১ অব্দে এঁর রচিত মারাঠী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থ হল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা প্রথম মারাঠী ভাষার ব্যাকরণ। অবশ্য পরবর্তীকালে বৈ. কা. রাজবাড়ে প্রমূখ সংস্কৃত পন্ডিতেরা এই ব্যাকরণের প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বার্ক-এর বক্তৃতাবলী অনূবাদ করেছিলেন ও সর্বপ্রথম মারাঠী ভাষায় লজিক অথবা তর্কশাস্ত্রের উপর পাঠ্যপূস্তক রচনা করেন। অপর যে ভাই, তাঁর নাম ছিল সীতারাম কেশব দামলে (১৮৭৮-১৯২৭)। তিনি ছিলেন সাংবাদিক, ঔপন্যসিক ও দেশভক্ত। 'জ্ঞানপ্রকাশ' ও 'রাষ্ট্রমত' এই দূই কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি কাজ করতেন। মূলশী সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্য দূ-বছরের মেয়াদে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দামলে পরিবারের সকলেই প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু বেশির ভাগই ছিলেন অল্পায়ূ। কেশবসূতের কবিতায় একটি যে বিয়োগান্ত বেদনার সূর প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার হয়তো অন্যতম কারণটাই এই। |  |
|  | ম্যট্রিক পাশ করার পর দারিদ্র্যহেতু কেশবসূত উচ্চশিক্ষার জন্য অগ্রসর হতে পারেন নি। ১৮৯০ অব্দে তিনি চাকরীর খোঁজ বোম্বাই যান। ডিগ্রী না থাকার দরূন তাঁর মনোমত চাকরী পেতে বেগ পেতে হয়েছিলে। উপরন্তু তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি তীক্ষ্ণ, ফলে বি. না. মন্ডলিক-এর মতো যে সব পারিবারিক বন্ধু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি কোনো সহায়তা নিতে চান নি। প্রথমে তিনি একটি মিশন স্কুলে মাস্টারীপদে যোগ দেন, পরে আমেরিকান মিশনারীদের পরিচালিত 'জ্ঞনোদয়' নামে খ্রীষ্টধর্মীয় পত্রিকায় অফিসে কাজ নেন। তারও কিছু কাল পরে তিনি |  |

| | | |
|---|---|---|
| | দাদর অঞ্চলে দাদর ইংলিশ স্কুলের মাস্টার হন। মাসে বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি বেতন তিনি কখনোই পাননি। ফলে সংসার খরচ নির্বাহের জন্য তাঁকে গৃহশিক্ষকতা করতে হত। আবার যখন বেকার হয়ে পড়তেন তখন নিতান্ত গ্রাসচ্ছাদনের জন্য দেশের গ্রামে তাঁকে ফিরে যেতে হত। ছেলে এরকম অনিশ্চিত ওঠা-পড়ার মধ্যে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করবে, স্রোতের শেওলার মতো কেবল ভেসে বেড়াবে, কোথাও খুঁটি গাড়তে পারবে না-এরকম অবস্থা কেশবসূতের বাবার কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে যেন কোনো একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠা পায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৮৯৩ অব্দে কেশবসূত স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বোম্বাই চলে যান। 'সিংহাবলোকন' প্রভৃতি কবিতায় যে স্মৃতিচিত্র পাওয়া যায় তা থেকে এ-সব পারিবারিক বাদবিসম্বাদের কিছু কিছু আন্দাজ পাওয়া যায়। কেশবসূত ১৮৯১ অব্দে কল্যণ অঞ্চলের এক ইংরেজি স্কুলে মাস্টারী পদে যোগ দেন। মাস্টারী করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মিলিটারি কমিসেরিয়েট বিভাগে কেরাণীর কাজ করতে থাকেন। টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবার সিগন্যালিং-কাজও শিখতে থাকেন। ইচ্ছার বিরূদ্ধে তাঁকে করাচীতে বদলি করা হয় বলে তিনি কমিসেরিয়েট-এর কাজ ছেড়ে দেন। ১৮৯৩ অব্দে ছয় মাসের জন্য তিনি সামন্তবাড়ি অঞ্চলে শিক্ষকতা করেন। | |
|  | কেশবসূত যখন মাস্টারী কাজ নিয়ে বোম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকবেন বলে স্থির করেছেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে তিনজন তরূণ সাহিত্যিক ও সম্পাদকের পরিচয় হয়। এঁরা ছিলেন কাশিনাথ রঘুনাথ মিত্র, জনার্দন ধোঁড়ো ভাঙ্গলে আর গোবিন্দ বালকৃষ্ণ কালেলকর। এই সময় কেশবসূত 'বিদ্যার্থী মিত্র' ও 'মাসিক মনোরঞ্জন' (স্থাপিত ১৮৯৫)- এই দূই পত্রিকায় বেশ কিছু কবিতা প্রকাশ করেন। মিত্র ও ভাঙ্গলে উভয়েরই বাংলা ও গুজরাটী ভাষায় বেশ দখল ছিল। ভঙ্গলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যস ও একটি গুজরাটী উপন্যাস মারাঠী ভাষায় অনূবাদ করেন। ১৮৯৪ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যস 'আনন্দমঠ' 'আনন্দ আশ্রম' নামে ভাষান্তরিত হয়। সেকালের প্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম' এই অনূবাদে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশবসূত তাঁর 'কবিতেচে প্রয়োজন' (মে, ১৮৯৯) কবিতায় জন্মভূমির উল্লেখ করতে গিয়ে 'বন্দেমাতরম' গানের 'সূজলা' 'সূফলা' বিশষণ প্রয়োগ করেন। বোম্বাইয়ে থাকাকালীন কেশবসূত আরও যে-সব কবির সংস্পর্শে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'মাধবানুজ' (ডাঃ কাশীনাথ হরি মোডক, ১৮৭২-১৯১৬), 'কিরাত' এবং গজানন ভাস্কর বৈদ্য (যিনি পরে 'হিন্দু মিশনারী' নামে বিখ্যাত হন)। বৈদ্য-এর ভাই স্মৃতি থেকে কেশবসূতের একটি রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। কেশবসূত প্রর্থ নাসমাজ (মহারাষ্ট্রে বাংলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের অনূরুপ প্রতিষ্ঠান), আর্যসমাজ ও খৃষ্টীয় মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতির আয়োজিত বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে ভালবাসতেন। ১৮৯৬ অব্দে বোম্বাইয়ে যখন দূরন্ত মহামারী প্লেগের প্রাদূর্ভাব ঘটে, সে সময় কেশবসূত শহর ছেড়ে খানদেশ-এর অন্তর্গত ভড়গাঁও নামক গ্রামে আশ্রয় নেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তাঁর স্ত্রীপূত্র পরিবারাদি চলিসগাঁওয়ে তাঁর শ্বশূরের আশ্রয়ে নিরাপদে থাকেন। শ্বশূর চালিসগাঁও-এর স্কুলে হেডমাস্টারী করতেন। শ্বশূরের পরামর্শক্রমে তিনি ভড়গাঁও এংলো ভার্ণাকুলার স্কুলে মাস্টারী পদের জন্য দরখাস্ত করেন এবং মাসিক ১৫ টাকা বেতনে বহাল হন। |  |
|  | ১৮৯৭ থেকে ১৯০৪ অব্দের মার্চ পর্যন্ত কেশবসূত খানদেশ-এ বসবাস করেন। গোড়ায় তিনি শিক্ষকতা করতেন ভড়গাঁও-এর ম্যুনিসিপ্যাল স্কুলে। কিন্তু সেখানে |  |

| | | |
|---|---|---|
| | বেতন কম ও পেন্সন-এর সুবিধা ছিল না বলে, ১৮৯৮ অব্দে তিনি সরকারী এস. টি. সি. পরীক্ষায় বসেন ও পাশও করেন। ১৯০১ অব্দে তিনি খানদেশ-এর ফৈজপুর হাইস্কুলে ইংরেজির মাস্টাররূপে যোগদান করেন। দুর্ভাগ্যের কথা বলতে হবে, পরের বছরেই ফৈজপুরে প্লেগের ধ্বংমলীলা শুরু হয় এবং আশংকা হয় যে হাইস্কুল হয়তো বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, কবি কারও পরোয়া করতেন না ও নিজের মতামত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতেন বলে, স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর ঠিক বনিবনাও হচ্ছিল না। তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত দিলেন, দরখাস্ত মঞ্জুরও হয়ে গেল। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস থেকে কেশবসুত ধারবাড় হাইস্কুলের মারাঠী শিক্ষকরূপে যোগ দেন। | |
|  | খানদেশ-এ থাকতে 'কাব্যরত্নাবলী' বলে কেবল কবিতার এক মাসিক-পত্রের সম্পাদকমশায়ের সঙ্গে কেশবসুতের পরিচয় হয়। এঁর নাম ছিল নারায়ণ নরসিংহ ফড়নীস। ইনি কবিতার একজন খাঁটি সমঝদার ছিলেন। কেশবসুতের বিষয়ে লিখেছেন: "যে-পাঁচজন কবি মারাঠী কাব্যসাহিত্যের রত্নস্বরূপ ছিলেন, কেশবসুত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁদের নিয়ে 'কাব্যরত্নাবলী' পত্রিকার বিশেষ গর্ব ছিল। তাঁর শেষ কবিতা যা আমরা প্রকাশ করি তার নাম ছিল 'হরপাল শ্রেয়' (হারানো আদর্শ)। কবি হিসাবে তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর কবিতার মহীমা ও তাঁর চিন্তাধারার ব্যপ্তি যেমন আনন্দের তেমনি বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তিনি ব্যবহারিক জীবনে অনভ্যস্ত ছিলেন বলে কখনো কখনো তাঁকে অব্যবস্থচিত্ত বেল মনে হত। আমাদের সঙ্গে বার দু-তিন তাঁর চাক্ষুষ সাক্ষাত হয়েছিল। কিন্তু আলাপ-আলোচনায় তাঁর গভীর সংকোচ ছিল বলে খুব বেশি কথাবার্তা হতে পারেনি।" (১৯০৫ অব্দের 'কাব্যরত্নাবলী'র সর্বশেষ সংখ্যা)। |  |
|  | খানদেশ-এ থাকতে আর যে-সব ব্যক্তির সঙ্গে কেশবসুতের সান্নিধ্য ঘটেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত স্বদেশী কবি 'বিনায়ক' (বিনায়ক জনার্দন করন্দীকর ১৮৭২-১৯০১)। ১৮৯১-৯২ অব্দে বোম্বাই শহরে দুজনের সাক্ষাত হয়। কেশবসুত তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'মহারাষ্ট্রের বায়রণ'। দুজনের মধ্যে অনেক মিল ছিল-দুজনেই ছিলেন সামাজিক অন্যায় ও রাজনৈতিক দাসত্বের ঘোরতর বিরোধী। কেশবসুতের এই শেষ জীবন অপেক্ষাকৃত আরামে কাটে। এই সময়ে তিনি তাঁর ঈপ্সিত প্রকৃতি-পরিবেশ যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি পেয়েছিলেন পঠনযোগ্য প্রচুর পুস্তক। এই সময়ে কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে তিনি গভীর বিচারে মগ্ন হন, ও নানারকম তাত্বিক প্রসঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ইংরিজেতে চিঠিপত্র লিখেছেন বলে দেখা যায়। এই সময়ে তাঁর কবিতায় এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। |  |
|  | এপ্রিল ১৯০৪ থেকে দেড় বছরকাল কেশবসুত ধারবাড়ে ছিলেন। এখানে থাকতে জীবনের অসারতা, ও জীবনের অনিবার্য পরিণাম বিষয়ে তিনি নিশ্চয় গভীরভাবে চিন্তা করে থাকবেন। হয়তো তাঁর অকাল বিয়োগের সম্ভাবনাও তিনি অস্পষ্টভাবে অনুমান করে থাকবেন। ১৯০৫ অব্দের ২৫ মে তারিখে চিপলূণে থাকতে তিনি তাঁর যে শেষ কবিতা লেখেন, সে বিষয়ে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: "'মনোরঞ্জনে' আমর রচনা পড়ে বুঝতে পারবেন সম্প্রতি আমার মনের অবস্থাটা কি রকম। হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হায়, এই ভগ্নহৃদয়ের প্রতিষেধক কোথায় মিলবে!" |  |
|  | সিত্যি, উপায় কিছু ছিল না। ওই বছরে অক্টোবরের শেষে তিনি হুবলিতে যান তাঁর দূর সম্পর্কিত কাকা হরিসদাশিব দামলেকে দেখতে। এই কাকা ছিলেন অসুস্থ ও |  |

| | | |
|---|---|---|
| | শয্যাগত। কেশবসূতের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যারাও গিয়েছিলেন। কথা ছিল, চার-পাঁচ দিন হুবলীতে থেকে তিনি ধারবাড় ফিরে যাবেন। কিন্তু ৭ নভেম্বরে তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। আট দিন পরে তাঁর স্ত্রীও একই মহামারীতে পতির অনূগামিনী হন। অসূস্থ কাকাকেই তাঁদের অন্ত্যেষ্টি সৎকার করতে হয়। তাঁদের তিনটি মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোংকণে। সেখানে অল্প দিনের মধ্যে একটি মারা যায়। অপর দূটির বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের সম্বন্ধে বিশষ কিছু জানা যায় না। | |
|  | উনচল্লিশ বছরের একটি হ্রস্ব জীবনের এইভাবে করূণ পরিসমাপ্তি ঘটল। এই অনতিদীর্ঘ জীবনের বিষয়ে কবি আপন কথাতেই বিশদভাবে বলে গেছেন। কবি সম্মেলনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: "প্রতি বছর কবিদের সম্মেলন বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন? সংসারী লোক বিষয়কর্মেক ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন। কবিরা তো স্বপ্নবিলাসী লোক। তাঁরা একান্তে থাকবেন, নৈঃশব্দের বাণী শূনবেন কান পেতে। যদি সরস্বতী প্রসন্ন হন, তাহলে সেই বাণী তাঁরা নিজেদের অপরিণত ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন। কদাচিত হয়তো দূচার জন সমানধর্মা একত্র হতে পারেন....কিন্তু তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক যদি ভিড় করে আসে তাহলে তো সমস্ত মজাই মাটি।" |  |
|  | আর একটি চিঠিতে সমসাময়িক মারাঠী কবিতার বিষয়ে অন্য এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: "তাঁকে দয়া করে বলবেন তিনি যেন একটি দীর্ঘ কবিতা রচনায় হাত দেন। ছোট ছোট কবিতা লিখে সময় নষ্ট করে কি লাভ! গত একশো বছরের মধ্যে মারাঠীতে একজনও উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ কবিতা রচনা করে যেতে পারেন নি। তাঁর মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তির উচিত মারাঠী সাহিত্যের এই কলঙ্ক মোচন করা। দূঃখের স্বীকার করতে হচ্ছে আমি নিজে তো বামন। কোনো দিন মাথা উচূ করে দাঁড়াব তার কোনো সম্ভাবনাও দেখছি না। নিজের সম্বন্ধে আমি তাই একটা গ্লানি অনূভব করি। আমার মতো যাদের 'ছোট' নজর, তাদের সম্বন্ধে তাই আমার মায়া হয়।" |  |
|  | উপরের উদ্ধৃতি দূটি কেশবসূতের মূল ইংরেজি চিঠি থেকে অনূবাদ। |  |

</body></text>
</Doc>